ছোট্ট পাখী চন্দনা - আর কেউ তো গায় না

কবিতা পারভেজ

গত ৯-ই আগষ্ট ২০০৪ । আমার আব্বা এম আর আখতার মুকুল বেঁচে থাকলে সেদিন তিনি ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ করতেন । অথচ মাত্র ৪৪ দিন আগে তিনি চিরদিনের মত তাঁর অতি আদরের ছেলেমেয়ে, বউমা, জামাতা, নাতি নাতনী ও ভাইবোনদের রেখে চলে গেলেন । পচাঁত্তরতম জন্মদিনের কার্ডটা আর আমাকে পাঠাতে হোল না । প্রতি বছর তাঁর জন্মদিনে কার্ড আর সেদিনের প্রথম ফোনটা যেন আমার হয় সেই চেষ্টা করতাম সব সময়ই । ফোনটা যখন ধরতেন - বলতেন কবিতা নিশ্চয়ই? আমি বলতাম আব্বা শুভ জন্মদিন । আমার চাকরি তখন UWS - এর রিচমন্ড ক্যাম্পাসে । তখনও লাঞ্চ টাইমে দৌড়ে গিয়ে চার্চের সামনের পে ফোনটা থেকে বলতাম আব্বা শুভ জন্মদিন । সময়ের ব্যবধানে আমরা দেশ থেকে ৪-৫ ঘন্টা এগিয়ে থাকাতে আমার সুবিধাটা ছিলো আমি জানতাম আব্বা তাঁর নিয়ম মাফিক রাত চারটায় উঠে লেখালেখি করছেন । আমি সে সময়ে ফোনটা করতাম । আব্বা হাসতেন আর বলতেন এটা কবিতার ফোন আমি জানতাম ।

আমার বিয়ে হয়েছে ২২ বছর আর বিয়ের আগে ৫ বছর ছিলাম শান্তিনিকেতনে তাই আব্বার কাছ থেকে ২৭ বছর দুরেই কাটালাম । তাঁকে একান্তে পাওয়া আমার ১৬ বছর । আমার স্বর্ণালী ১৬ টি বছর । কত কথা কত স্মৃতি । কোনটা রেখে কোনটা বলি ।

বোধকরি বছর ১৪/১৫ আগে শেখ হাসিনা, সিমিন হোসেন রিমি আর শিল্পী কামরুল হাসানের মেয়ের (দু:খিত কিছুতেই তাঁর নামটা মনে করতে পারছি না) তাঁদের বাবাকে নিয়ে স্মৃতি কথা কোন এক পত্রিকায় পড়েছিলাম । লেখাগুলো আমার মনে খুব দাগ কেটেছিলো । তখন মনের অজান্তেই ভেবেছিলাম না জানি আমাকেই না কবে এমনি করে লিখতে হবে আমার বাবার স্মৃতি কথা ।

আমার যখন থেকে জ্ঞান তখন থেকেই দেখতাম এবং বুঝতে পারতাম আমার ওপর আব্বার একটা অতিরিক্ত আদর কাজ করে । তাতে করে তখন আমার একটা ধরনা আমি আমার আব্বার পেট থেকে হয়েছি আর বাকী ভাইবোন মায়ের পেট থেকে । তাই আমার রাগ অভিমান গর্ব ইত্যাদি একটু বেশীই ছিলো বাকীদের থেকে । আমার মায়ের কাছে শুনেছি আমি নাকি রাতে প্রায়শ:ই আব্বার লুঙ্গিটা বুকে নিয়ে দরজার কাছে ঘুমিয়ে যেতাম এই ভেবে - আব্বা যখন বাসায় আসবেন তখন লুঙ্গিটা আমার কাছে চাইলেই আমি যেন দিতে পারি । পত্রিকা অফিসে নাইট ডিউটি করে শেষ নিউজ কি হবে ইত্যাদি সব দেখে তবেই না আমার আব্বার বাড়ী ফেরা । সাংবাদিকদের ছেলেমেয়েরা তাদের বাবাকে খুব কমই কাছে পায় । তবে আব্বা চেষ্টা করতেন ছুটির দিনগুলো আমাদের নিয়ে কাটাতে । আমাদের নিয়ে ছোটখাটো ট্রিপে চলে যেতেন ময়মনসিংহ, নরসিন্দি, টাঙ্গাইল নয়তো কুমিল্লা । সেসব জায়গাতে বিখ্যাত দেখার জিনিস এবং খাবার আমাদের দেখাতেন ও খাওয়াতেন । বলতেন সেসব জায়গার ইতিহাস এবং সে জায়গায় তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি । ফেরার পথে নদী থেকে সদ্য ধরা মাছ তাঁকে কিনতেই হবে । বড় বড় তাজা মাছ কেনার খুব সখ ছিলো তাঁর । একেকদিন ভোররাতে সোয়ারী ঘাটে চলে যেতেন যেখানে সারা দেশ

থেকে সব মাছ আসে এবং পাইকারী হিসেবে বিক্রি হয়। প্রায়ই একঝাঁকা ইলিশ এবং তার সাথে অন্যান্য বড় বড় মাছ নিয়ে আসতেন। বাড়ীর সবাইকে ডেকে দেখাতেন, বলতেন কোন মাছ সেদিন কিভাবে রান্না হবে।

মাছ মুরগী কেনার একটা উপদেশ দিতেন। বলতেন রুই মাছ কিনতে হবে ৩০ বছর চাকরী হয়ে গেছে। কাতলা মাছ কিনতে হবে রিটায়ার্ড করে গেছে। আর মুরগী কিনতে হবে ম্যাট্রিক দিচ্ছে দিচ্ছে। এভাবে মাছ মুরগীর বয়স বুঝাতেন। আমি যখন নিজের সংসারে নিজেই বাজার করা শুরু করলাম তখন একদিন আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম মাছ কিনতে গেলে কিভাবে চিনবো মাছ পচা না ভালো। আব্বা বললেন - রুই মাছের সব সময়ই পেট দেখবি - ওদের পেটটা তাড়াতাড়ি নরম হয়। ইলিশ কিনবি ঘাড় দেখে। ঘাড়টা যত মোটা ততই ভালো কারণ ওটা নদীর স্রোতের উল্টো দিকে চলেছে। তাই বেঁটে কিম্বা ছোট হলেও ঘাড় যত মোটা তত স্বাদ বেশী হবে। আব্বার দেয়া উপদেশ মনে রেখে বাজার করা ধরেছিলাম আজও তাই গরুর মাংস কিনতে ৩০ কিলোমিটার দূরে Auburn চলে যাই। অন্যান্য হালাল মাংসের দোকান থেকে এদের দেয়া মাংসটা ভালো।

মুক্তিযুদ্ধের কালে একাত্তরের মার্চের শেষার্ধে আমরা যখন ঢাকা থেকে বগুড়া, জয়পুরহাট, হিলি, মালদহ হয়ে কলকাতায় পৌছালাম ততদিনে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। যখন বর্ডার পার হচ্ছিলাম আমার আব্বা-আম্মার চোখে পানি। কোন আজানার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আর এদিকে আমরা ভাইবোনরা খুব খুশী কারণ আমরা বিদেশ যাচ্ছি।

একাত্তরে কলকাতায় দশমাস এক অদ্ভূত জীবন ছিলো আমাদের। তখন আমরা ভাইবোনরা কেউ স্কুলে যেতাম না। স্কুলে নিলো না কারণ তখন বছরের প্রায় মাঝামাঝি সময়। তার উপর আমাদের থাকা খাওয়ারই টাকা পয়সা নেই তাই স্কুলের কথা এক রকম ভুলেই গেলাম। আমাদের দৈনিক রুটিন ছিলো সকালে নাস্তা খেয়ে আব্বার সাথে হেঁটেই ৫৫ নং বালিগঞ্জ প্লেস এ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রেকর্ডিং স্টুডিওতে যাওয়া। আব্বা চরমপত্রের রেকর্ডিং করতেন। আম্মা (প্রয়াত ড. মাহমুদা আখতার) 'মুক্তিযোদ্ধার মায়ের চিঠি' শীর্ষক একটা অনুষ্ঠানে মা হিসাবে চিঠি পড়তেন। আমার মায়ের লেখা কয়েকটি ছড়া আমিও তখন পড়েছি। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হচ্ছে সম্প্রতি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একটি ওয়েবসাইট চালু হয়েছে যেখানে অন্যান্যদের সাথে আমার মায়ের কোন ছবি - এমনটি নামটাও অনুপস্থিত।) তখন দেখতাম কত কষ্ট করে সমর দাস, রথীন্দ্রনাথ রায়, হরলাল রায়, আপেল মাহমুদ, আব্দুল জব্বার এবং আরো অন্যান্য গুনীজনরা গান লিখে সুর করে কিভাবে রিহার্সেল, রেকর্ডিং করতেন। আব্বার সাথে পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানে গিয়েছি। আমাদেরকে যে আদর আপ্যায়ন ওরা করেছে তা সত্যি উল্লেখযোগ্য।

একজন অন্ধ গায়ককে আব্বা একদিন ট্রেন থেকে ধরে নিয়ে এলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান গাইবার জন্য। লোকটি (তাঁর নামটা আজ আর মনে নেই) ট্রেনে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তিনি পরবর্তীতে প্যারোডি ধরনের গান গাইতেন। একটা গান আমার মনে আছে - ইয়াহিয়ার পিঠে চড়ে স্বর্গে যাবো গো, মুজিবকে সাথে নিয়ে স্বর্গে যাবো গো।

বালিগঞ্জ প্লেস থেকে আবার হেঁটে এসে ২৫ নং ট্রামধরে চৌরঙ্গী চলে যেতাম। সেখান থেকে হেঁটে রেডিয়েন্ট প্রসেস প্রেসে, যেখান থেকে জয়বাংলা পত্রিকাসহ অন্যান্য লিফলেট

তাঁরা বিনা পয়সায় ছেপে দিতেন। শুধু তাই নয়, প্রেসের মালিক নিরোদ বরণ মুখার্জী ও সুধীর চন্দ্র মুখার্জী এঁরা দু ভাই সকলের খাওয়ারও ব্যবস্থা করতেন। সুধীর মুখার্জী রোটারী ক্লাব থেকেও অনেক টাকা পয়সা সংগ্রহ করে সাহায্য করেছেন আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে। দিন শেষে যখন বাড়ী ফিরতাম দেখতাম অফিস ফেরতা লোকগুলো রাস্তার পাশে মুদী দোকান গুলোর সামনে ভীড় করে আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন। বিশেষ করে আব্বার চরমপত্র শুনে তবেই তাঁরা বাড়ী ফিরতেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম যে, যে শহরে ওরা আমাদের বাংলা বলা নিয়ে হাসাহাসি করতো এবং আমাদের বাঙাল বলতো সেখানে আমার আব্বার চরমপত্র যে কেমন পপুলার ছিলো তা ভেবে সত্যিই অবাক হতে হয়।

একদিন বেশ সকালে আমাদের বাসার দরজায় জোরে জোরে শব্দ। আমরা দুবোন তখন সামনের ঘরে ঘুমাতাম। দরজা খুলে দেখি ধুতি পাঞ্জাবী পরা বেশ সৌম্য চেহারার এক ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন এটা কি চরমপত্র পাঠকের বাড়ী? আমি বললাম হ্যাঁ। তাঁর সাথে কি একটু দেখা করতে পারি? আমি ভদ্রলোককে বসতে বলবো কিন্তু আমাদের বাসায় তো কোন চেয়ার নেই। কিছুই বললাম না। ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই থাকলেন। আব্বা তখন সবে সেদিনকার চরমপত্র লেখা শেষ করেছেন। দৌড়ে আব্বাকে বলতেই তিনি এলেন লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা অবস্থায়। ভদ্রলোক রীতিমত দৌড়ে এসে আব্বাকে জড়িয়ে ধরে বললেন - মশায় করেছেন কি? আমাদের বাঙাল ভাষাটাকে একেবারে সার্বজনীন করে ফেলেছেন। দেশ ভাগের সময় আমরা যখন বর্ডার পার হয়ে এদেশে এসেছিলাম তখন আমাদের কথা শুনে ওরা হাসতো। আস্তে আস্তে ভুলেও গিয়েছিলাম মাতৃভাষাটাকে। আবার এই আপনিই আমাদের মনে করিয়ে দিলেন আমাদের পৈতৃক দেশ এবং মাতৃভাষার কথা। এখনতো সবার মুখে মুখে শুনি আপনার চরমপত্রের কথা। আমি খুবই গর্বিত মশায় আপনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন। আমার মা তাড়াতাড়ি কয়েকটা পরোটা আর আলু ভাজি করে ভদ্রলোককে আমাদের সাথে নাস্তা করতে বললেন। পাটিতে বসে তিনি আমাদের সাথে নাস্তা খেলেন। তাঁর বদৌলতে সেদিন আমাদের ভাগ্যে পরোটা জুটেছিলো।

কত কথা কত স্মৃতি। সব খেই হারিয়ে ফেলছি। ভাষা আন্দোলন করেছেন আমার আব্বা। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান চরমপত্রের লেখক ও পাঠক ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হলেন। লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস কাউন্সিলর। বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের যুগ্ন-সচিব। শেষে অবসর নিলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের পরিচালক হিসাবে। যতকিছুই করেছেন কখনো লেখালেখি ছাড়েননি। জীবনের শেষ সময়ে জ্ঞান থাকা অবদি লিখে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস যেন নতুন প্রজন্ম জানতে পারে তাই লিখলেন তাঁর সাড়া জাগানো বই - আমি বিজয় দেখেছি। এছাড়াও সর্বমোট ৩৬ খানা বই লিখেছেন। কত হাজার হাজার মানুষকে যে চিনতেন। নামও মনে রাখতে পারতেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিলো। ইতিহাসের সন তারিখ পাত্রপাত্রী মুখস্থ বলতে পারতেন।

খুবই রসিক ছিলেন। একবার ভাইয়ার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাচ্ছি আব্বা ভাইয়াকে বললেন - শোন্, মেয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করবি মেয়ের এই চেহারা বিশ বছর পর তোর সহ্য হবে কিনা! আমরা তো অবাক। বললেন কম বয়সে সব মেয়েকেই সুন্দর লাগে

কিন্তু বিশ বছর পর কি হতে পারে তা কল্পনা করার চেষ্টা করবি। আমার আব্বার সাথে আমরা খুবই ফ্রী এবং ফ্র্যাঙ্ক ছিলাম। আমাদের কোথাও যাওয়ার সময় আব্বা খেয়াল করতেন কেমন সাজগোজ করেছি। তিনি চাইতেন তাঁর বাড়ীর মেয়েরা সব সময় সুন্দর কাপড়-চোপড় পরবে। দামি হতে হবে তা নয় তবে মার্জিত হতে হবে। লাল, কমলা ইত্যাদি রং খুব পছন্দ করতেন। সিডনি বেড়াতে এলে বেশ কিছু কাপড়-জামা আমি কিনে দিয়েছিলাম। তার মধ্যে কমলা চেকের একটা জামা ছিলো নিজেই সেটা পছন্দ করেছিলেন। পরবর্তীতে ওটা তাঁর খুবই প্রিয় সার্ট হয়ে গেল। কেউ তাঁর ছবি তুলতে এলে বা টিভিতে প্রোগ্রাম করতে গেলে ওই সার্টটাই পরতেন। ভাবী মাঝে মাঝে বলতো- আব্বা, লোকে মনে করবে আপনার আর সার্ট নাই। আব্বা বলতেন দেখবে কত সুন্দর ছবি উঠবে।

আমাকে যেদিন আমার শ্বশুর বাড়ী থেকে দেখতে আসে অনেক গল্পসল্পের পর আমাকে আব্বা ওঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন - এই হচ্ছে আমার বড় মেয়ে কবিতা। ওর জন্মের পর থেকে আমার জীবনে উন্নতি। ও আমার ঘরের লক্ষী। আশা করি আপনাদের সংসারেও লক্ষী হবে। আব্বা ডুকরে কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। দেখি ঘরে তখন সবার চোখে পানি।

ছোট বেলায় যখন আব্বার সাথে প্রায়ই প্রেসক্লাবে যেতাম আব্বার সহকর্মী বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতেন মা তোমার নাম কি? আমি বলতাম - কলিজা, বুড়িমা, ছোট্ট পাখী চন্দনা আর কবিতা। আমি ভাবতাম আব্বা যেহেতু আমাকে ওই সবগুলো নাম ধরেই ডাকেন অতএব ওগুলো বুঝি আমার নাম। ছোট বেলায় আমাকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানোর সময় তাঁর ঘুমপাড়ানী গান ছিলো - ও আমার ছোট্ট পাখী চন্দনা।

আমার বিয়ের দিন কন্যা সম্প্রদানের পর হঠাৎ আমার আব্বাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। অনেক খোঁজ করে আমার মামা শ্বশুর সাংবাদিক জনাব আবু তাহের দেখেন হোটেল ইন্টারকনের তিনতলায় এক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আব্বা কাঁদছেন। আমার সামনে কাঁদলে যদি আমি বেশী কান্নাকাটি করি এই ভেবে তিনি লুকিয়ে কাঁদছেন। আমার আব্বাকে আমি হাতে গুনে কয়েকদিন কাঁদতে দেখেছি। ১৯৭১-এ জুলাই মাসে আমার দাদার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর আব্বা সেদিন শিশুর মত ডুকরে কেঁদেছিলেন। শোকে চরমপত্র লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। আমার মা বললেন সাড়ে সাত কোটি লোক তোমার চরমপত্রের দিকে চেয়ে আছে। এরপর আবার লেখা শুরু করলেন - দিনা কয়েক আছিলাম না, বিচ্ছুগো কারবার দেখতে গেছিলাম।

দ্বিতীয়বার আব্বাকে একইভাবে কাঁদতে দেখলাম যে মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেলেন। আমার প্রথম সন্তান হবার সময় কমপ্লেকেসি দেখা দেয়ায় ডা: ফিরোজা অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমাকে ওটিতে নেওয়ার সময় আব্বা খুব কেঁদেছিলেন। আর শেষ কাঁদতে দেখলাম ২০ জুন। আমি ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে সোজা বারডেমের ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চলে গেলাম। আমার ভাতিজী কুন্তলা বললো দাদু দাদু দেখো কবিতা ফুপু এসেছে। আব্বা চোখ মেললেন। অসহায় চোখে তখন পানি ঝরছে। কিছু বলতে পারলেন না। এতো যন্ত্রপাতি আর অক্সিজেন মাস্কের মধ্যে আব্বার বুকে শেষবারের মত ঝাঁজিয়ে পড়া আর হোল না।

২০০৩-এ তিনি চিকিৎসাধীন লন্ডনে। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। ১৬ মে যেদিন ফিরে আসি তাঁর সাথে আমার শেষ কথা। আমি কাঁদছি তিনি বলছেন ইনশাল্লাহ দেশে আবার দেখা হবে।

দেখা হোল বটে তবে এভাবে আমার আব্বাকে আমি দেখতে চাইনি। বুকফাটা যন্ত্রনা নিয়ে মৃত্যুশয্যায় তাঁর চলে যাওয়াটা দেখছি প্রতিদিন। দেখছি তিনি ক্রমশ:ই আমাদের এতিম করে চলে যাচ্ছেন। নিস্তেজ ঘুমিয়ে পড়ছেন। আমাদের শত ডাকাডাকিতে আর জেগে উঠছেন না। অবশেষে ২৬ জুন শেষ বিকেলে তাঁর ছোট্ট পাখী চন্দনাকে ঘুম না পাড়িয়ে নিজেই ঘুমের দেশে চলে গেলেন।

এখনো নির্ঘুম রাতে যেন শুনতে পাই আব্বা গাইছেন - ও আমার ছোট্ট পাখী চন্দনা।

করুনাময় আমার আব্বাকে জন্নাতবাসী করুন।